হুগলী-চুঁচুড়ার গোড়াপত্তন ও হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভা

অনিলকুমার দত্ত

হুগলী শহরটি পরিকল্পিত শহর নয়। নদী-সংলগ্ন স্থানেই এই শহরের বিস্তার ঘটে। মীরকালা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শু করে দক্ষিণে জোড়াঘাট পর্যন্ত এর বিস্তার। লম্বায় প্রায় ৪ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ২ মাইলের সামান্য বেশি। শহরটিকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয় উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অর্থাৎ পৌর এলাকার তিনটি ওয়ার্ড যেমন সাহাগঞ্জ, কেওটা ও ব্যান্ডেল তিনটি বসতিপূর্ণ স্থান। এর মধ্যে সাহাগঞ্জ বেশ বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্র। বলা হত বড়গঞ্জ। বঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল ঔরঙ্গজেবের নাতি আজিম-উশ-শান ঐ অঞ্চলে ব্যবসায়ের প্রসার দেখে ঐজায়গাটির তাঁর নিজের নামানুসারে সাহাগঞ্জ রাখেন। ব্যবসায় সাহাগঞ্জের প্রসার দেখে অনেক পরিবার এখানে বসবাস করতে আসেন। এদের মধ্যে নন্দী পরিবার খুব বিখ্যাত। তাঁরা কাঁচড়াপাড়া থেকে এখানে আসেন। বীরের নন্দী ওরফে বী নন্দী ব্যবসাসূত্রে এখানে এসে আর ফিরে যান নি। পিতার সঙ্গে মনোমালিন্যের দন তিনি ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে চলে আসেন ও রাম ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে ব্যবসা-বা নিজ্য শু করেন।পরবর্তী সময়ে তিনি একাই ব্যবসা শু করেন ও বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি তাঁর ব্যবসার বেশ কয়েকটি শাখা তৈরি করেন। স্থানীয় জমিদার তাঁর কৃতকর্মের ফলে খুবই সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হন। সেই সময় তাঁরই দেওয়ান বী নন্দী রোশন আলির কিছুমূল্যবান সম্পত্তি ত্রয় করেন।

কেওটা ঃ সাহাগঞ্জের দক্ষিণে কেওটা। নামটা শুনেই বোঝা যায় এক সময়ে কৈবর্ত্ত্য সম্প্রদায়ের লোকেরাই ঐ অঞ্চলে বসবাস করত । কেওটা কথাটি কৈবর্ত্ত্য শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু নামী ব্যক্তি ঐ অঞ্চলে বসবাস শু করেন। বাড়ির জমি প্রায় কয়েক একর। শ্রীদে'র বাড়ির উত্তরে মহানন্দ গুপ্তর বাড়ি। ঐ বাড়িটি পূর্বে প্রাক্তন জেলাশাসক ডি. সি. স্মিথের ছিল। প্রথমে ঘুঁটিয়াবাজারের পীতাম্বর পাইন স্মিথ সাহেবের বাড়িটি ত্রয় করেন। আবার তাঁর কাছ থেকে মহানন্দ গুপ্ত বাড়িটি ত্রয় করেন। ঐ সম্পত্তির পশ্চিমে আরও একটি বড় বাগান গুপ্ত মহাশয় ত্রয় করেন।

কেওটার দক্ষিণে বিখ্যাত ব্যান্ডেল। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে বলাগড় নামেই পরিচিত। পর্তুগীজদের জন্যই স্থানটি খ্যাতি অর্জন করে। পশ্চিমের এই নাবিকেরা বা সমুদ্রগামী ব্যক্তিরা ষোড়শ শতাব্দির শেষার্দ্ধে এখানে এসে বসবাস করতে শু করে ও ব্যবসা করতে থাকে। তারা বলপূর্বক স্থানীয় বাসিন্দাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করত। ঐ অঞ্চলে বেশকিছু বড় বাড়ি ছিল। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ঐ অঞ্চলে বাস করতেন। কেওটা যাবার পথে ব্যান্ডেলের সীমানায় সার্কিট হ াউস ছিল।

হুগলীর মধ্যবর্তী অঞ্চল খুব ঘন বসতিপূর্ণ। বালি, প্রকৃত শহর ও ঘোলঘাট। বড় পরিখার পশ্চিমে ডাকঘরের পাশ দিয়ে নদীর দিকে চলে গেছে। বালি নামটি ঐ অঞ্চলের একজন মোহন্তর নামানুসারে হয়েছে। ঐখানে যেসেতুটি আছে সেটি ডি. সি. স্মিথ সাহেবের সময় হয়েছে। বালির পশ্চিমে রায়রায়ান বাজার, চলতি কথায় রায়বাজার নামে একটি গুত্বপূর্ণ অঞ্চল আছে। ঐ রায়রায়ান বাজার নিয়ে দুটি মতবাদ আছে। একজনদের মতে আলমচাঁদনামে জনৈক লালা কায়স্থ ঐ বাজারের মালিক। তিনি ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন ও দিল্লীর মোগল দরবারে তাঁর বেশ আধিপত্য ছিল আর তাঁকে রায়রায় ান অর্থাৎ রাজকুমারদের প্রধান বলে ভূষিত করা হয়। তিনি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শু করেন ও বিশাল বাড়ি তৈরি করেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। একটি ঠাকুরবাড়ি তৈরি করে সেখানে রাধাকৃষ্ণের মুর্তি স্থাপন করেছিলেন। সেখানকার

বনজঙ্গল পরিস্কার করে বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এতদঞ্চলে সবথেকে বড় বাজার দৈনিক বাজার। আলমচাঁদ সৎভাবে জীবনযাপন করেন। তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় তাঁরযাবতীয় সম্পত্তি তাঁর বিধবা স্ত্রী মাখন বিবির উপর বর্তায়। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি জনৈক সারস্বত ব্রাহ্মণ পুযোত্তমদাস মোহান্তকে যাবতীয় সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দান করেন। তাঁর অন্তিম দশার সময় তাঁর গুভাই রামপ্রসাদ মোহন্তকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ ও মাল া ঐখানে কবর দেওয়া হয়। তার ওপর ইঁট দিয়ে কবর দেওয়া হয়। প্রত্যহ চন্দন ও ফুল দিয়ে পূজা করা হয়।

রামপ্রসাদের পর সুখলাল মোহান্ত সেবাইত নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান সেবাইত রামপ্রসাদের বংশধর।

পূর্বে বলা হয়েছে, রায়রায়ান নিয়ে দুটি মত আছে। এবারে দ্বিতীয় মতটি হল, জনৈক হরি মল্লিক বাজারটি তৈরি করেন। তিনি খুব ধনী ও প্রভাবশালী ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁকে রায়রায়ান উপাধিতে সম্মানিত করেন। তিনি হেস্টিংসের সময় ঢাকার ভূবাসন অফিসার ছিলেন। ঐ অঞ্চলের পশ্চিমদিকে তাঁর বসতবাড়ি ছিল। কলিকাতার নিমাই চরণ মল্লিক তঁ ার আত্মীয়। আজকে ঐ বাজারের অস্তিত্ব নেই। ঐ অঞ্চলের কিছু জমি সরকার থেকেনেওয়া হয় ও গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড তৈরি করা হয়। আলমচাঁদের ঠাকুরবাড়ির কাছেই আরও পুরাতন একটি আখড়া আছে যা বড় আখড়া নামে পরিচিত। এর প্রতিষ্ঠা করেন চতুর দাস বাবাজি নামে খুব নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ব্যক্তি। বালিযখন বনজঙ্গলে ভরা, সেই সময় তিনি কোথা থেকে আসেন, জানা যায় নি। তিনি তিনশো বছর আগে এখানে আসেন। ঐবনে তিনি শাঁখ বাজিয়ে পূজা করতেন। শাঁখের আওয়াজ শুনে হুগলির রাজ্যপাল খোঁজ নেন। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বনজঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি করতে অ াদেশ দেন। তিনি দু'দিন চেষ্টা করেও দেখা পান নি। তৃতীয় দিনে দেখা পান। কিছুদিন পরে একটি আখড়াবাড়ি তৈরি করে দেন, যেখানে ঐ সাধু শান্তিতে সব কাজ করতেপারেন। কয়েক বছর পর তিনি দেহ রাখেন আর ঐখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তারপর রামকৃষ্ণ দাস মোহান্ত এই মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও সুষ্ঠুভাবে সেবা কাজ চালিয়ে যান। একটি উইলের বলে সাহাগঞ্জের নিকটস্থ খামারপাড়ার আখড়াবাড়িটিও বালির বড় আখড়ার মোহান্তের অনুকূলে দেওয়া হয়। ঐ আখড়াবাড়িটি ভিখারীদাস মোহান্তর সম্পত্তি ছিল। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন তিনি ত্রিবেণীর দরাফ খাঁ গাজীর সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে, একবার দরাফ খাঁ কে বড়, তা প্রমাণ করবার জন্য বাঘের পিঠে চড়ে এ আখড়াবাড়ির কাছে এলেন ও জিজ্ঞাসাবাদ করেন, ভিখারিদাস কোথায়? তখন তিনি দাঁতন করছিলেন। দরাফ খাঁ কে বাঘের পিঠে দেখে তিনি তখন আখড়াবাড়ির দেওয়ালে তিনবার হাত ঠুকলেন ও বলেন, এগিয়ে চল। তাঁরা যখন মুখোমুখি হন, তখন দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর দরাফ খাঁ হিন্দু সাধকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। এরপর তিনি হিন্দুধর্মের প্রশংসা করতে থাকেন। পরে সংস্কৃত ভাষা শিখে গঙ্গাস্তোস্ত্র লেখেন। বর্তমানে মন্দিরে রাধা, কৃষ্ণ ও জগন্নাথ ও তার ভাই-বোনের মূর্তি আছে। এটি রামসরণ মোহান্তর সময় তৈরি হয়েছিল। রামসরণ মোহান্ত ১২৭৩ সালে শ্রাবণ ম াসে দেহ রাখেন।

রায়রায়ান বাজারের উত্তরে তেওয়ারিপাড়া। এখানে তেওয়ারি ব্রাহ্মণেরা বাস করত বলে তেওয়াড়িপাড়া নামকরণ হয়েছে। এদের মধ্যে সবথেকে ধনী ও শক্তিশালী ছিলেন পূরণ তেওয়ারি। তেওয়ারিপাড়ার উত্তরে পালপাড়া। পূর্বে মালপ াড়া নামে পরিচিত ছিল। একসময় তারাই ঐ অঞ্চলে থাকতো। মালেরা নিম্নবর্ণ শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। পালপাড়ার সবথেকে ধনী ব্যক্তি ছিলেন শিবচন্দ্র পাল। তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। তাঁদের তৈরি করা পাকা শ্মশানটি আজও বর্তমান। কালীঠাকুরের মূর্তিটি অবশ্য হুগলির নায়েব নাজির ভৈরবচন্দ্র মুখার্জি করে দেন ও তাঁর বংশধরেরা আজও তাঁর দেখাশে ানা করেন।

রায়রায়ান বাজারে পূর্বদিকে বড়ালপাড়া। সুবর্ণবণিক সমাজের বড়ালেরা এই অঞ্চলের অধিবাসী। নিজ প্রচেষ্টায় কা র্তিকচন্দ্র বড়াল উন্নতি করেছিলেন। তিনি কোম্পানির কাগজের দালালি ও সোনার বাটের ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রসাদ দাস বড়াল পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। বালির সবথেকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি গৌরী সেনও ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। ছেত্রী সম্প্রদায়ের নন্দলালবাবু বালির একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। হুগলিতে তাঁর প্রচুর সম্পত্তি ছিল। তিনি ধার্মিক ছিলেন ও প্রচুর দানধ্যান করতেন। তাঁরই বাড়ির অতিথিশালায় প্রতিদিন প্রচুর লোক আহার করতেন। বালির অধিব াসীদের সুবিধার্থে রাধানাথ বাবুর বিধবা স্ত্রী পিয়ারীবিবি একটি সুন্দর স্নানের ঘাট তৈরি করান। উদ্ধারণদত্ত ঠাকুরও মাঝে মাঝে বালিতে এসে থাকতেন।

বালির অধিবাসীরা অন্যান্য অধিবাসী অপেক্ষা শিক্ষার সুযোগ বেশি পেতেন। হুগলি ব্রাঞ্চ বিদ্যালয় থাকায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা লাভবান হয়। কিন্তু মহিলাদের এই সুযোগ ছিল না। ১৮৭৬ সালের ২রা জুন মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন হয়। ১৮৭৮ সাল থেকে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মিস এলিস রেক্সকে বিদ্যালয়টির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর পরিচালনায় বিদ্যালয়টি খুবই সুনাম অর্জন করে। তিনি প্রসাদদাস বড়াল ও লালবিহারী বড়ালের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এছাড়া চুঁচুড়া ও হুগলি জেনানা মিশন স্থাপনের সময় ঐ মহিলার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এছাড়া ঘুঁটিয়াবাজার, চুঁচুড়া ও শুঁড়িপাড়ার বিদ্যালয়ে তাঁর অবদান আছে। বালি ও মূল শহরের সংযোগকারী সেতু পার হয়ে আমরা যেখানে একসময়ে মোগলদুর্গ ছিল, সেখানে আসি। ঐখানে চুঁচুড়া হস্তান্তরের আগে আদালত ও বিভিন্ন করণ (Office) ছিল। ঐখানে নর্মাল বিদ্যালয়, আবাসিকদের আস্তানা ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস দেখা যায়। বিদ্যালয় ভবনের অপর পারে রাস্তার পশ্চিমে ডাঃ টি. ওয়াইজ কর্তৃক স্থাপিত রোড শেষ অফিস দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে মি মস রেক্সের জেনানামিশনের শিক্ষিকারা ঐ স্থানে বাস করতেন। ঐখানে সুবর্ণযুগের সময় বনিকদের গৌরব ফক্কট উজ্জারের বিশাল অট্টালিকা। ঐখান থেকে তুরাণগড় শু হয়ে সায়েস্তাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। তুরাণগড় তুরাণি মোগলদের অঞ্চল মোগলপুরা অবস্থিত - এই অঞ্চল চকবাজার রাস্তা ছেড়ে পুবদিকে ইরাণি মোগলদের বাস। ক্ষণস্থায়ী নবাব সরফরাজ খানের পুত্র খাজা আব্দুল করিমখানের জন্য তুরাণগড়ের নাম ও সুখ্যাতি। কাজি লাল মহম্মদের বাড়িও ঐ অঞ্চলে । এই মুসলমান বিচারকের বাড়িকাজির দেওড়ি নামে খ্যাত।

তুরাণগড়ের পশ্চিমে সোনাটুলি। ঐ অঞ্চলে স্বর্ণকারদের বাস ছিল। সোমাটুলির পশ্চিমে আলিপুর।

সায়েস্তাবাদের সরকারি উকিল শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থপতিবিদ্যার গৌরব বাড়িটি দেখতে পাই। এই বাড়িটি ‘‘রোজ ভিলা’’ নামে খ্যাত। এখানে ‘‘Rose villa’’ ফলকটি লাগানো আছে। তিনি নিজের প্রচেষ্টায়

খুব নগণ্য থেকে খুব উচচ শিখরে উঠেছিলেন। তিনি খুব বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। তিনি জনপ্রিয়, সৎ ব্যক্তি ছিলেন। আজও লোকে তাঁকে ভোলে নি।

ঐ বিরাট বাড়ির দক্ষিণ অংশে বর্তমান নির্বাহী বাস্তুকারের বসতবাড়ি দেখতে পাওয়া যায় । ঐ বাড়ির দক্ষিণে উন্মুক্ত স্থানে আর একটি বাড়ি ছিল (বর্তমানে নেই)। সেই বাড়িতে বাইরের থেকে যাঁরা আসতেন, তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। ঐ বাড়িতে কাজি নজল ইসলাম বেশ কিছুদিন ছিলেন। শশীভূষণ হাওড়া থেকে এখানে আসেন।হাওড়ার বাড়িতে আজও দুর্গাপুজো হয়। তাঁর বংশধরেরা এখানে থেকে গেছেন। সায়েস্তাবদের পশ্চিমে ‘কাপাসডাঙ্গা’। এখানে একসময়ে প্রচুর কার্পাস গাছ ছিল যা থেকে ঐ স্থানের নাম কাপাসডাঙ্গা হয়েছে। ঐ স্থানের গর্ব আনন্দ মোহন বসু। তিনি কলিকাতা সদর আদালতের সহ নিবন্ধকার ছিলেন। রামতনু চত্রবর্ত্তী ঐ অঞ্চলের অন্যতম বিখ্যাত লোক । তাঁর বড় ছেলে হরিনারাযন চত্রবর্ত্তী স্বনামধন্য দ্বারকানাথের সহপাঠী ছিলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সহ নিবন্ধকারের কাজ করতেন। পরে মুন্সেফ হয়েছিলেন। ঐ দুই পরিবারের পতনের ফলে ঐ অঞ্চলে বসবাস করা বিপদজনক হয়ে যায়।

এক সময়ে মোগলপুরার পূর্বে ইমামবাজার ও তৎসংলগ্ন হাট ছিল। বর্তমানে হাটটি আর বসে না। এখানে দুটি ইমামবাড়া আছে যারমধ্যে অনেক ঘর আছে। ঐ সমস্ত ঘরে অনেক মুসলমান পরিবার বাস করে। ওর পাশাপাশি কয়েকটি হিন্দুদের বাড়ি আছে। এটি ইমামবাড়ার রন্ধনশালার পাশে। ইমামবাড়ার ঠিক দক্ষিণে ঘোলাঘাট। নামটি খুবই পরিচিত ও বিখ্যাত। এইখানে ১৬৫০ সালে ক্যাপ্টেন জন ব্রুকহাম ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে কুঠি নির্মাণ করা শু করেন। শেষ হবার পর জেম্স ব্রিজমান প্রধান হয়ে আসেন। ১৬৫৮ সালে জর্জ গটন প্রধান হয়ে আসেন। ১৬৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্ট্রেন শাম মাস্টার বঙ্গে ইংরেজদের বসতি নিশ্চিত করতে প্রধান কুঠি তৈরি করতে আসেন। তিনি কুঠি করবার নির্দেশ দেন। একটি বড় কুঠি তৈরি হয় ও পাশাপাশি একটি গির্জাও তৈরি হয় ।জোব চার্ণক ১৬৮৬ সালে হুগলির কুঠির দায়িত্ব নেন। ঐ সময় হুগলি শহর নদীর পশ্চিম তীর বরাবর দক্ষিণে চুঁচুড়া পর্যন্ত লম্বায় দুই মাইল আর উত্তরে ব্যান্ডেল পর্যন্ত। কুঠিকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য চার্ণক কুঠির উচচতা বাড়াবার মনস্থ করেন ও কাজ শু করেন। যখন বেশ কিছু উচচতা করা হয়, তখন ধনী মোগলেরা ও মোগলপুরার সৈয়দরা ও ঘোলঘাটের মুসলমানেরা আপত্তি জানায়। তাদের ধারণা, মহিলাদের আব্রু থাকবে না। হুগলির ফৌজদার মীর নাজির প্রদেশিক রাজ্যপাল নবাব জাফর খাঁকে জানান ও কুঠির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। চার্ণক অপমানিত বোধ করেন ও অন্য জায়গায় কুঠি স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকেন, বিশেষ করে কলকাতায়।

ঘোলঘাটের চৌধুরী ও ঘোষ পরিবার বেশ বিখ্যাত ছিল।ঘোষ পরিবারের এক শাখা বাবুগঞ্জে বসবাস শু করেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com